মনে পড়ে

পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমেশানন্দজীর মধুর স্মৃতি

কণা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজ্যপাদ প্রেমেশানন্দজীকে প্রথম দর্শন করি ১৯৫০ সালে, বহরমপুর কাদাই অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি দ্বিতল ভাড়াবাড়িতে। সে-বছরেই বহরমপুরে এসে গার্লস কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি। বাবার স্টেনোগ্রাফার ফণীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী—যাঁকে আমরা ভাইবোনেরা সকলে 'কাকাবাবু' বলতাম—তাঁরই মাধ্যমে আমরা পরিবারের সকলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হই। কাকাবাবুর সঙ্গেই প্রথম আমরা তিন বোন* পূজ্যপাদ প্রেমেশানন্দজীকে দর্শন করি ও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। পূজনীয় মহারাজ তখন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে অবসরজীবন যাপন করতেন আর মুর্শিদাবাদ জেলা ও সংলগ্ন অঞ্চলের বহু মানুষকে অত্যন্ত সহজ, সরল, সরসভাবে মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পথনির্দেশ দিতেন। ঋষিপ্রতিম, ছোটখাট চেহারার মানুষটির আন্তরিক, সহজ সহাস্য ব্যবহারে মুগ্ধ হতেন সকলে।

আমরা যখন মহারাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, বয়স ও নানাবিধ অসুস্থতার কারণে তাঁর শরীর তখন বেশ দুর্বল। তবু জীবনের মূল উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য আর কোনও প্রসঙ্গ তাঁকে করতে শুনিনি। প্রসন্নতা, প্রফুল্লতা ও সরসতা তাঁকে সর্বদা ঘিরে থাকত। তার কাছে গেলেই সহজ আনন্দের একটা প্রবাহের স্পর্শ যেন আমাদেরও উৎফুল্ল করে তুলত।

আমরা যখন তাঁকে প্রথম দর্শন করি, পূজ্যপাদ মহারাজ তখন সারগাছি আশ্রমের লাল রঙের একতলা বাড়ির পশ্চিমের ছোট ঘরটিতে একটা ছোট্ট চৌকিতে থাকতেন—সেই ঘরটির পুণ্য স্মৃতি আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বহরমপুরে তখন তিনি আসতেন মূলত চিকিৎসার প্রয়োজনে। মিশনের ভাড়া বাড়িতে থাকতেন—কাদাই অঞ্চলের ছোট্ট বাড়িটির দোতলার একটা ঘরে। এই বাড়ি থেকে বহরমপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম গোরাবাজার অঞ্চলের কয়েকটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়, যেখানে পূজ্যপাদ মহারাজের অসুস্থ অবস্থায় থাকা সম্ভব ছিল না। লালদিঘি অঞ্চলের নিজস্ব বাড়িতে মিশন আসে ১৯৫৫ সালে।

লালদিঘির যে-বাড়িতে বর্তমানে আমি বাস

* লেখিকার দুই দিদি পরবর্তী কালে শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনী—প্রব্রাজিকা তপস্যাপ্রাণা (প্রয়াত) ও প্রব্রাজিকা সাধনপ্রাণা।

করি, সেই বাড়ির একতলার পশ্চিমদিকের ঘরে পূজনীয় প্রেমেশানন্দজী ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত চিকিৎসার কারণে এসে অবস্থান করতেন। অন্য সময় বাড়িটি খালিই থাকত, কারণ বাড়ির মালিক চাকরির কারণে কলকাতায় থাকতেন।

১৯৫৫ সালে বহরমপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নিজগৃহে স্থানান্তরিত হওয়ার পর মহারাজ বহরমপুরে এলে আশ্রমবাড়ির একতলা বড় হলঘরটির দক্ষিণ পশ্চিমাংশে একটি ছোট চৌকিতে অবস্থান করতেন এবং ভক্তদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

গীতা ও কথামৃত নিয়মিত পাঠের বিষয়ে মহারাজ সদাই স্মরণ করিয়ে দিতেন। তাঁর সেই সুমিষ্ট আন্তরিক কণ্ঠস্বর যেন আজও শুনতে পাই। বলতেন, ''ওগো মা, অচেনা-অজানা পথে চলতে গেলে ম্যাপ ও টাইম টেবিলের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কোথায়, কোনদিকে কোনপথ দিয়ে যাব, তার সঠিক দিক নির্ণয়ের জন্য ম্যাপের নির্দেশ জরুরি; আর সঠিক পথে যাত্রা শুরু করার পর দরকার টাইম টেবিলের সহায়তা। কোথায় এলাম, কতদূর এলাম, সময়মতো গন্তব্যস্থানে যাচ্ছি কি না, সেটি সঠিক জানা-বোঝার জন্য টাইম টেবিল দেখলে নিশ্চিত হওয়া যায়। তেমনই, জীবনে সঠিক নির্দিষ্ট পথে চলার জন্য গীতা ও কথামৃত ম্যাপ ও টাইমটেবিল গো মা! এদুটিকে আমাদের নিত্যসঙ্গী করা বড়ই দরকার। এদের নির্দেশমতো চলতে পারলে জীবন সঠিক পথে স্থিরভাবে এগিয়ে যাবে মা।''

আজ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সেই পরম মূল্যবান স্মৃতি রোমন্থন করতে বসে সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বয়সের ভারে দুর্বল স্মৃতি, আর অতীত দিনের পুণ্য প্রসঙ্গ মনকে বড়ই ভারাক্রান্ত করে তুলছে। মনে হচ্ছে সেই অবিশ্বাস্য প্রাপ্তির কতটুকুই বা লিপিবদ্ধ করতে পারব!

মানুষ যে মূলত পঞ্চকোষে আবরিত নিত্যমুক্ত আত্মা—এই সার সত্যটি প্রায়ই মহারাজ উদাহরণ সহযোগে আমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট করিয়ে দিতেন। তাঁর সহাস্য বদনে বলা কথাগুলি আজও অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয় : ''ওগো মা, স্নানের প্রস্তুতিপর্বে আমার দেহে যে-যে-আবরণগুলি আছে তা যেমন একটি একটি করে উন্মোচন করতে হয়, তেমনিভাবেই স্বস্বরূপ উপলব্ধির জন্যও আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের আবরণকে উন্মোচিত করতে হয় একাগ্র নিষ্ঠায় আর আন্তরিক প্রচেষ্টায়। নিজের স্বস্বরূপ উপলব্ধি করাই যে আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য গো মা!''

বিষয়টি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্য মহারাজ বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বলতেন, ''আমার গায়ের এই চাদরটা যেন অন্নময় কোষ—অতি স্থূল প্রাথমিক আবরণ। তারপর এই মস্ত সোয়েটার পরবর্তী আবরণ—প্রাণময় কোষ। তারপরে রয়েছে এই ছোট সোয়েটার—সেটা যেন মনোময় কোষ। এর পর রয়েছে এই ফতুয়া—এটা যেন বিজ্ঞানময় কোষ, বুদ্ধির আবরণ; সবশেষে এই গেঞ্জি—এটা যেন স্বরূপ উপলব্ধির সর্বশেষ সূক্ষ্ম ব্যবধান—আনন্দময় কোষ। এই পঞ্চকোষের আবরণ অতিক্রম করে স্বস্বরূপ উপলব্ধি করাই যে আমাদের জীবনের লক্ষ্য গো মা! সে-চেষ্টা যে নিরন্তর আন্তরিকভাবে করে যেতেই হবে!''

পূজ্যপাদ প্রেমেশানন্দজীর চরণপ্রান্তে বসা এবং তাঁর সরল, সহজ, মূল্যবান পথনির্দেশ পাওয়ার জন্যই আমরা—অর্থাৎ বেবিদি (পরবর্তী কালে প্রব্রাজিকা অসিতাপ্রাণা), আমার ছোট বোন ও আমি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই সারগাছি আশ্রমে যেতাম। আশ্রমে প্রবেশ করে মহারাজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে আগমনবার্তা জানাতাম, তিনিও হাসিমুখে সম্ভাষণ করতেন। তারপর ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম করে খানিকক্ষণ বসে আমরা নিচে

মহারাজের ঘরে চলে আসতাম। কোনওদিন তাঁর ঘরে পৌঁছতে একটু দেরি হলে তিনি ঠাট্টা করে বলতেন, ''কী গো মা, এত দেরি যে! আমি তো ভাবলাম সমাধি-টমাধি হল নাকি মায়েদের।'' প্রায়দিনই জিজ্ঞেস করতেন, ''মোহন্তকে প্রণাম করে এসেছ তো মা!'' আমরা যদি বলতাম, ''ওঁকে পরে প্রণাম করব মহারাজ, এখন প্রথমে আপনার কাছে একটু বসি।'' সঙ্গে সঙ্গেই বলতেন, ''না মা, না। যাঁর যা প্রাপ্য সম্মান তাঁকে তা যথাসময়ে দিতে হয় গো! সুখদানন্দ এই আশ্রমের মোহন্ত। তাঁকে আগে প্রণাম করে আসতে হয় গো মা! যাও মা যাও, আগে তাঁকে প্রণাম করে তারপর এখানে এসো।''

স্বামী সুখদানন্দজী পূজনীয় প্রেমেশানন্দজীর থেকে বয়সে অনেক ছোট। সারগাছি আশ্রমের সম্পাদকের কার্যভার তিনি মহারাজের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দান সম্বন্ধে মহারাজ সর্বদা সচেতন থাকতেন এবং অন্যদেরও সচেতন করতেন।

আবার কোনও কোনওদিন পূজনীয় মহারাজের ঘরে প্রবেশ করার একটু পরেই বলতেন, ''ওগো মা, আমাদের কী সুন্দর দোতলা স্কুলবাড়ি হয়েছে। ওখান থেকে কেমন সুন্দর বহরমপুর দেখা যায়। যাও না গো মা একবার স্কুলবাড়ির দোতলা থেকে সব দেখে এসো।'' আমরা ছোটদের মতো আপত্তি জানিয়ে যদি বলতাম, ''এই মাত্রই তো বহরমপুর থেকে এলাম মহারাজ, আবার ওখান থেকে নতুন কী দেখব?'' মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, ''যাও না গো মা, একবার যাও, উঁচু থেকে সব দেখতে কেমন লাগে আমায় এসে বলবে।'' অনিচ্ছাসত্ত্বেও পূজনীয় মহারাজের আদেশ পালন করতে আমরা স্কুলবাড়ির উদ্দেশে রওনা হই। ফিরে এসে তাঁকে বলি, ''ভাগ্যিস গিয়েছিলাম মহারাজ। উঁচু থেকে দূরে দূরে কত কিছু যে দেখা যাচ্ছিল! খুব ভাল লেগেছে মহারাজ, খুব ভাল লেগেছে।'' সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ বলতেন, ''ওগো মা, physically একটু উঁচুতে উঠলে যদি এত ভাল লাগে, তাহলে বলো তো মা, mentally উঁচুতে উঠতে পারলে আরও কত ভাল লাগবে! মাগো, তোমরা সব অনিত্য বিষয় থেকে মন সরিয়ে এনে সেই চির আকাঙ্ক্ষিত নিত্য বস্তুতে মন স্থির করে সকলে আনন্দে ভরপুর হয়ে যাও, এ যে আমার সর্বক্ষণের চাওয়া গো মা! সর্বদা মনকে উচ্চ চিন্তায় নিমগ্ন রাখতে পারলে আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকা যায় মা!'' মহারাজের চৌকিতে বসা সেই উজ্জ্বল মুখচ্ছবি—যিনি সর্বদা ওই নিত্যানন্দে ভরপুর হয়ে থাকেন—এখনও মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে আছে। কত সামান্য বিষয় থেকে মুহূর্তে গভীর প্রসঙ্গে চলে যেতেন, সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের মনকেও সেই পবিত্র সুরে বেঁধে দিতেন। তাঁর পূতসঙ্গ দীর্ঘদিন লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল ভেবে নিজেকে ধন্য মনে হয়। তাঁর দেওয়া মূল্যবান পথনির্দেশ কতটুকু যে নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছি, তা বুঝতে পারি না। অবশ্য হিসাব করে কোনও লাভ নেই, বরং আন্তরিকভাবে বলি, ''যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয়ধন।''

আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সেই অমূল্যপ্রাপ্তির কথা ভেবে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আন্তরিক প্রার্থনা জানাই, বাকি দিনগুলি যেন ভালভাবে কাটে।

কয়েকটি কথা বারংবার বলে মহারাজ সঠিক জীবনচর্যা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতেন। তার মধ্যে বিশেষ একটি কথা প্রায়ই মনে পড়ে। তিনি বলতেন, ''সাধু হইয়ো, সাধু সাজিয়ো না; গৃহস্থ সাজিয়ো, গৃহস্থ হইয়ো না।'' কত সংক্ষেপে কী অসাধারণ, মূল্যবান নির্দেশ!

আর একটি দিনের কথা মনে পড়ে। গীতা প্রসঙ্গ পূজনীয় মহারাজের অতি প্রিয়। একদিন ওই প্রসঙ্গে

নানা কথার পর আমায় তিনি বললেন, ''গীতার একটি শ্লোক বলো তো মা, শুনি, কিন্তু দোহাই তোমার মা'', মজা করে বললেন, ''ওই 'জোদা জোদা হি ধম্মস্য' যেন বোলো না মা। শুনতে শুনতে কানে ঘা হয়ে গেছে।'' আমরা সকলে ওঁর মজা করে বলা কথা শুনে খুব হাসলাম। তারপর ভাবতে থাকি গীতার কোন শ্লোকটা মহারাজকে শোনাব। একটু ভেবে নিয়ে ধীরে ধীরে বলি,

''বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সঃ শান্তিমধিগচ্ছতি॥''

চোখ বন্ধ করে খুব নিবিষ্ট মনে মহারাজ শুনলেন। তারপর প্রসন্ন মুখে বললেন, ''মাগো, এই শ্লোকটি তোমার মনে আছে জেনে আমার কেমন আহ্লাদ হচ্ছে জানো মা? লাখপতির ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে বাপের যেমন আহ্লাদ হয়। বাবা ভাবেন, মেয়ের আমার কোনওদিনই খাওয়াপরার অভাব হবে না। এই শ্লোকটা তোমার মনে আছে জেনে আমি নিশ্চিন্ত। তোমার জন্য আমার আর কোনও চিন্তা নেই গো মা।'' পূজ্যপাদ মহারাজের এই আশ্বাসবাণী আমার পরম সম্পদ।

আর একটি দিনের স্মৃতি। চিত্রা ও বেবিদি তখন বহরমপুরে বি.টি. পড়ছে, আর আমি গার্লস কলেজের লাইব্রেরির দায়িত্বে আছি। ১৯৫৭-৫৮ সাল হবে। বেবিদি একদিন বিকেলে কলেজে এসে আমায় বলল, ''খুব দরকার কণা, একবার প্রেমেশ মহারাজের কাছে যাবে?'' কিছুক্ষণ পরে আমরা সারগাছির উদ্দেশে রওনা হই। পথে বেবিদি বলে বি.টি. কলেজে কে ওর হাত দেখে বলেছে, ওকে বিয়ে করে সংসারী হতে হবে। অথচ বেবিদি মঠে যোগদান করার সংকল্প স্থির করে মঠের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, তাই হাতের রেখার নির্দেশ জেনে সে বড়ই উদ্বিগ্ন। সে-কারণেই পূজনীয় প্রেমেশ মহারাজের সঙ্গে সে কথা বলতে চায়।

আশ্রমে পৌঁছে পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম করে আমিই তাঁকে সব কথা জানালাম। সব শুনে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, ''কী হাতের রেখা! হাতের রেখা কচকচ করে কেটে দেবে গো মা। আমার হাতে একটা নয়, দু-দুটো বিয়ের রেখা ছিল। হাতের রেখা কচকচ করে কেটেছি গো মা। হাতের রেখা! হাতের রেখা কী করবে? যা করার সে তো তুমি নিজে করবে।''

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ''পাণিনির নাম শুনেছ তো মা, মস্ত বড় ব্যাকরণবিদ? তাঁর কিশোর বয়েসের একটা কাহিনি বলি শোনো। একবার তিনি বন্ধুদের সঙ্গে যাওয়ার সময় পথের ধারে এক হস্তরেখাবিদকে দেখতে পেলেন। কৈশোরের কৌতূহলবশে সকলে তাঁকে হাত দেখাতে শুরু করলেন। পাণিনির হাত দেখে তিনি বললেন, 'তোমার তো সবই বেশ ভাল দেখছি, কিন্তু তোমার বিদ্যালাভ হবে না।' পাণিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কেমন করে বুঝলেন যে আমার বিদ্যালাভ হবে না?' হস্তরেখাবিদ পাণিনির হাতের একটা রেখা দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখো, এটা বিদ্যারেখা, এটা মাঝপথেই থেমে গেছে।' শুনে পাণিনি তৎক্ষণাৎ নিজের কোমর থেকে একটা ছোট ছুরি বার করে নিজের হাতের তালু কেটে তাঁকে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'এই আপনার সামনে আমি হাতে নতুন রেখা সৃষ্টি করলাম, আপনাকে দেখিয়ে যাব আমার বিদ্যালাভ হয় কি না।' মাগো, একে বলে পুরুষকার, মানসিক দৃঢ়তা। যা স্থির করব নিজে, তা করবই।'' এইভাবে বেবিদিকে সাহস দিলেন, আশ্বস্ত করলেন মহারাজ।

এই ঘটনার দু-এক বছর পরেই বেবিদি শ্রীসারদা মঠে যোগদান করেন এবং পরে সন্ন্যাস লাভ করে প্রব্রাজিকা অসিতাপ্রাণা নামে পরিচিত হন।

এই দিনটির কথা কখনও ভুলব না। শান্ত মৃদুভাষী মহারাজের কী দৃঢ় কণ্ঠস্বর সেদিন আমরা শুনেছিলাম!

১৯৬২ সাল—বছরটা আমার জীবনে বড়ই

দুঃখের। বছরের শুরুতেই, জানুয়ারি মাসে আমার দীক্ষাগুরু পরমপূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে মিলিত হয়েছেন। আবার জুন মাসেই প্রয়াত হলেন পরমপূজনীয় স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ—যাঁর অগাধ স্নেহ-সমাদর শুভেচ্ছা আমাদের ভরে রাখত। ওই বছর আমি কলকাতায়। লাইব্রেরিয়ানশিপ ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয়েছি। পর পর এই দুই আঘাত আমায় অস্থির করে তুলল। পরম শুভানুধ্যায়ী প্রেমেশ মহারাজের জন্য খুব মন কেমন করছিল তখন। তাই বহরমপুর গিয়ে পরদিনই সারগাছি আশ্রমে তাঁর কাছে গেলাম। প্রণাম করে বসামাত্রই তিনি মজা করে বলতে লাগলেন, ''কীগো মা! দুই ছেলে ঠাকুরের কাছে চলে যাওয়াতে আর এক বুড়ো ছেলের জন্য অস্থির হয়ে উঠে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে তাকে দেখতে চলে এসেছ তো!'' মহারাজের কথা শুনে আমি আর কান্না চেপে রাখতে পারলাম না। আমি একটু শান্ত হতে মহারাজ নরম সুরে বলতে লাগলেন, ''কেমন মাগো তুমি? ওঁরা যখন তাঁদের পুরনো শরীরের যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছিলেন, তখন তোমার তাঁদের জন্য কষ্ট হয়নি, আর এখন তাঁরা পরম আনন্দে মায়ের আদরে রয়েছেন, তখন তোমার দুঃখ হচ্ছে, কান্না পাচ্ছে! তুমি কেমন মা গো?'' মহারাজের কথার কী যে জবাব দেব তখন! একটু পরে নিজেকে শান্ত করে বললাম, ''মহারাজ, একা একা এই অবস্থায় কলকাতায় আর থাকতে পারছিলাম না, তাই আপনার কাছে চলে এসেছি; ফিরে গিয়ে আবার পড়াশোনা করব মহারাজ। পরপর ওঁরা দুজন চলে যাওয়াতে, আপনার জন্য যে বড্ডই মন কেমন করছিল!'' মহারাজ এবার প্রসন্ন মুখে হাসতে থাকলেন আর ধীরে ধীরে অন্য প্রসঙ্গ শুরু করলেন।

স্বামী প্রেমেশানন্দ

ওই বছর আগস্ট মাসে ডিপ্লোমা পরীক্ষান্তে বহরমপুরে ফিরে জানতে পারলাম প্রেমেশানন্দজীর শরীর ক্রমশই বেশি অসুস্থ হচ্ছে, সেজন্য সময়মতো যথাযথ চিকিৎসার প্রয়োজনে তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার কথা মঠ কর্তৃপক্ষ ভাবছেন। আমাদের একান্ত আপনজন সারগাছি ছেড়ে যাবেন জেনে বড়ই অসহায় বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার দিয়ে বুঝছি তাঁর শরীরের কারণে এ-সিদ্ধান্ত তো আশু গ্রহণ করাই প্রয়োজন। ডিসেম্বর মাসে তাঁকে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা হয়। একটু সুস্থ হওয়ার পর তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁকে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে স্থানান্তরিত করা হয় ১৯৬৩ সালে। সেসময় থেকে পুণ্য বারাণসী ধামেই মহারাজের অবস্থিতি ছিল।

সম্ভবত ১৯৬৫ সালে বন্ধু কল্পনা সহ কাশীধামে

গিয়ে তাঁর দর্শনলাভ করি। কাশীতে লাকসা রোডের উপর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে পৌঁছে পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজের অনুমতিক্রমে আমরা মহারাজের ঘরে প্রবেশ করি। ছোট একটা চৌকিতে প্রশান্ত বদনে মহারাজ মুদ্রিতনেত্রে শায়িত। পূর্বপরিচিত সেবক ব্রহ্মচারী সনাতন মহারাজ (বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পরমপূজনীয় স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ) আমাদের আগমনবার্তা মহারাজকে জানালেন। তিনি সহাস্যে আমাদের দিকে তাকালেন। অতি ক্ষীণ তনু, ততোধিক ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে কিছু বললেন। তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টিপাতে অনুভব করি, আমায় চিনতে পেরে কিছু বলছেন। আমার কণ্ঠ রুদ্ধ, চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত। কিছুক্ষণ পর মনে মনে প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় বসে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকি। আশ্রমের আবাসস্থলে এসে পুরনো দিনের নানান স্মৃতি মনের পর্দায় ভাসতে থাকে।

বিকেলে পূজনীয় মহারাজের ঘরে যাওয়ার পথে সুসজ্জিত বাগানের পাশের রাস্তায় দেখি সেবক মহারাজ একটি খুব নিচু হুইল চেয়ারে শায়িত পূজ্যপাদ প্রেমেশ মহারাজকে নিয়ে খুবই ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছেন। আমাদের দেখে তিনি থেমে যেতেই পূজনীয় মহারাজ চোখ খুলে আমাদের দেখে সহাস্যে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কিছু বললেন, তারপর খুব ধীরে ধীরে ডান হাতটা তুলে আবার কিছু বলে চোখ বন্ধ করে নিলেন। সেবক মহারাজও তাঁকে অন্তরের গভীরে নিমগ্ন হতে দেখে পুনরায় ভ্রমণ শুরু করলেন। আমরা নির্বাক হয়ে ভারাক্রান্ত মনে অশ্রুসজল চোখে সেখানে দাঁড়িয়েই থাকি। অনুভব করি, মায়ের অতি আদরের সন্তান এখন তাঁর স্নেহময় ক্রোড়ে ফিরে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বহির্জগৎ থেকে তাঁর মন এখন অন্তরের অন্তঃস্থলে সম্পূর্ণ নিমগ্ন। আর তাঁকে বিরক্ত করা অপরাধ। মনে মনে তাঁকে ভক্তিনত প্রণাম জানিয়ে এবার শেষ বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হই।

মনে পড়ে যায় বেবিদি মঠে যোগদান করার পর নিজের জন্য আক্ষেপ জানিয়ে পূজ্যপাদ মহারাজকে একদিন বিষণ্ণ মনে আমার মনোবেদনার কথা নিবেদন করি—''এঁদের মতো বৈরাগ্য, ত্যাগ, ঈশ্বরানুরক্তি কিছুই যে আমার নেই মহারাজ! আমার জীবনটা যে বৃথাই কেটে যাচ্ছে! আমার ভবিষ্যৎ যে কী তা তো কিছুই বুঝতে পারি না!'' সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ সেদিন পরম স্নেহে আন্তরিকভাবে আমায় নিশ্চিন্ত করে বলেছিলেন, ''তোমার জন্য আমার কোনও চিন্তা নেই গো মা। তোমার দেওয়া মালা যে গদাই ঠাকুরের গলায় দুলছে, এ তো আমি দেখতে পাই গো মা!'' মহারাজের এই স্থির প্রত্যয়—এ যে আমার পরম সম্পদ। নিজে আমি কিছু বুঝি বা না বুঝি, সত্যদ্রষ্টা ঋষির এই উক্তি তো বৃথা হওয়ার নয়!

''মিথ্যা হেরে না ঋষির নয়ন।
ঋষির রসনা মিছে না কহে।''

পূজ্যপাদ প্রেমেশানন্দজীর স্বহস্তে লেখা অনেক চিঠির মধ্যে একটা চিঠির অংশবিশেষ আমার অন্তরের গভীরে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে—''পরম স্নেহের মা কণা, জীবনপ্রভাতে শঙ্কর মাঝির নায়ে চড়ে রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেছ, তোমার মতো ভাগ্যবতী জগতে দুর্লভ...।''

বারো বছরেরও বেশি সময় পরমপূজনীয় প্রেমেশানন্দজীর পবিত্র সঙ্গ লাভ করে, তাঁর আন্তরিক স্নেহ-সমাদরে সিক্ত হওয়ার পরম পুণ্য সৌভাগ্য লাভ করে আমি ধন্য, কৃতকৃতার্থ। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আন্তরিক প্রার্থনা জানাই, এই অনন্যসাধারণ অমূল্য প্রাপ্তির যথাযোগ্য মর্যাদা যেন রক্ষা করতে পারি।